অভিশাপ

(গল্পগ্রন্থ – বিধু মাস্টার)

—"এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি।"

আমি সবিস্ময়ে সেই ভগ্নস্তূপের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি ?সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না। দিনান্তের অস্পষ্ট আলোক যাই যাই করিয়াও আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে তখনো অপেক্ষা করিতেছিল। পরিশ্রান্ত বিহগকুলের অবিশ্রাম কূজনধ্বনি রহিয়া রহিয়া তখনো আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া দিতেছিল। গঙ্গার অপূর্ব তরঙ্গভঙ্গ চিত্তলোকে এক অজ্ঞাতচেতনার সঞ্চার করিতেছিল। সেই প্রদোষের ম্লান দ্যুতিবিকাশের অন্তরালে আমি প্রাতঃস্মরণীয় সুবিখ্যাত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদের পানে চাহিয়া দেখিলাম। গঙ্গার ঠিক তীরভূমিতে অগণিত লতাপল্লবে মণ্ডিত হতশ্রী প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। নদীস্রোতের অবিরাম আঘাতে সে প্রাসাদের অনেকখানিই ভাঙিয়া চুরিয়া কোন্ অনির্দেশের পথে বহিয়া গিয়াছে। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ যাহা এখনো বর্তমান আছে, তাহা সেই হতগৌরবের কঙ্কালবিশেষ; এখন যেন সেখানে সেই দুর্দান্তপ্রতাপ প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রেতাত্মা বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতি তাহাকে আজ নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছে, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য তাহাকে শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গার বক্ষে একটি নৌকা পাল তুলিয়া পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। একটি মাঝি গান গাহিতেছিল। তাহার সেই ক্লান্ত কণ্ঠস্বর সন্ধ্যাপ্রকৃতির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া কোন্ দূরান্তের এক অপূর্ব সাড়া বহিয়া আনিতেছিল।

পলাশপুরের প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর নাম শোনে নাই এমন লোক খুব কমই আছে। একদা তাঁহার প্রতাপে সারা পলাশপুর তটস্থ হইয়া থাকিত। কিংবদন্তী আছে যে সেকালে নাকিবাঘে-গরুতে নির্বিবাদে একই ঘাটে জলপান করিত। অতবড় ক্ষমতাশালী বর্ধিষ্ণু প্রতিপত্তিশালী জমিদার সেকালে খুব কমই ছিলেন। ইংরেজ-রাজত্বের সূচনার দিন হইতে পলাশপুরের চৌধুরী-বংশের উদ্ভব। ইংরেজ-বাহাদুরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার পুরস্কার-স্বরূপ ধূর্জটিনারায়ণ চৌধুরী এই পলাশপুরের জমিদারি লাভ করেন। ধূর্জটিনারায়ণ চৌধুরী চৌধুরীবংশের আদিপুরুষ। তাঁরই পৌত্র বিজয়নারায়ণ চৌধুরী সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ব্যারাকপুরের বিদ্রোহদমনে ইংরেজদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেন লরেন্স সপরিবারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসে সেসব কথা নাই বটে তবে সকলেই সে কথা জানিত। ১৮৫৭সালের মার্চ মাসের শেষদিকে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ কালো করিয়া দিয়াছিল, বিজয়নারায়ণ সে সময়ে ব্যারাকপুরে। সেদিনও এমন ছিল। ক্যাপ্টেন লরেন্স বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর কর্মকুশলতায় তাঁহাকে স্বীয় তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। বহুকাল সেইতরবারি চৌধুরী বংশের প্রাচীরে অতি সন্তর্পণে অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ টাঙানো ছিল।

বেলেডাঙার কমল হালদারের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে তার দেশে গিয়াছিলাম বেড়াইতে। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পলাশপুরের চৌধুরীবাড়ির নিকট আসিয়া পড়িলাম। কমল বলিল, এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি।

ইতিপূর্বে চৌধুরীবংশের অতীত কাহিনীর আমি অনেক কিছুই শুনিয়াছি। তাঁহাদের সেই বিরাট প্রাসাদের এই দুর্দশা দেখিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া গেলাম। এখন মানুষ সেখানে বাস করে না। সেটি এখন হিংস্র পশুর লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর সময় চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল। চতুর্দিকে চৌধুরীবংশের প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপনারায়ণের সময়ে যেমন চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল, সেই প্রতাপনারায়ণের সময়েই তাহার আবার ভাঙন শুরু হয়। অমানুষিক দুশ্চরিত্রা ও প্রচুর মোকদ্দমার ফলে তাঁহার পতন শুরু হয় মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেই। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগলসাম্রাজ্য যেমন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই আবার তাহার পতন শুরু হয়। বৃদ্ধ সম্রাট বহু দুঃখেই দূর দক্ষিণাপথে প্রাণত্যাগ করেন। ঔরঙ্গজেব ছিলেন চরিত্রবান ও ধার্মিক, আর প্রতাপনারায়ণ ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। তাঁহার অভিধানে চরিত্র বলিয়া কোনো শব্দ ছিল না। মদ ও মেয়েমানুষ তাঁহার জীবনের একমাত্র উপাস্য। আর এ ছাড়া যেটুকু সময় পাইতেন তাহাতে মামলা-মোকদ্দমার তদবির করিতেন। তাঁহার

ন্যায় নিখুঁতভাবে মোকদ্দমা তদ্‌বির করিতে সেকালে খুব কম লোকই পারিত। অথচ লেখাপড়ার তিনি ধার ধারিতেন না, আইন তো দূরের কথা। কত সতীরমণীর আর্তক্রন্দনে নিঃশব্দ রাত্রে চৌধুরীবংশের সুদীর্ঘ রঙমহল যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নেই। তাহাদের সেই ব্যাকুল কণ্ঠধ্বনি ঝিল্লীরবের সহিত তালে তালে শব্দিত হইয়া মরিতেছে। তাহাদের বিকট অট্টহাস্য হয়তো এখনো ভগ্নপ্রাসাদের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া খাইয়া ফিরিতেছে।

তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরীকে আর ভালোবাসিয়াছিলেন পত্নীর বিধবা ভগিনী আভাময়ীকে। ক্ষীরোদাসুন্দরীর প্রতিবাদ করিবার সাহস হয় নাই। আর বালবিধবা আভাময়ী প্রতাপনারায়ণের প্রেমের তরঙ্গে সংক্ষুব্ধ হইয়া আত্মীয়স্বজনের বিষদৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। এ ঘটনার পর প্রতাপনারায়ণ আর ক্ষীরোদাসুন্দরীর মুখদর্শন করেন নাই। সেই অভাগী রমণী চার মাসের শিশুপুত্র সূর্যনারায়ণ চৌধুরীকে বুকে লইয়া স্বামীর দৃষ্টিপথের অন্তরালে জীবন-কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আর প্রতাপনারায়ণের উচ্ছলতার মাত্রা গেল বাড়িয়া। তিনি বাহির-বাড়িতেই দিন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আভাময়ীর প্রতি সমাজের এই অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিকার স্বরূপ তিনি তাঁহার প্রজাদের শান্তির সংসারে দিতে লাগিলেন আগুন জ্বালাইয়া। গৃহস্থবন্ধু বা গৃহস্থকন্যা তাঁহার ক্ষুধিত দৃষ্টি হইতে অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিত। সারাদিন পথে পথে পাখিমারা বন্দুক কাঁধে লইয়া পাখি মারিয়া ফিরিতেন। সে পথে কোনো স্ত্রীলোকেরবাহির হইবার সাহস ছিল না। আর তাঁহার সঙ্গে থাকিত কানা কালু সর্দার। কানা হইলে কি হয়, চক্ষুষ্মানকেও সে হার মানাইতে পারিত। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে প্রতাপনারায়ণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইত সহজেই। ইংরেজ রাজত্বের এমন ধরাবাঁধা আইন তখন ছিল না। প্রতাপনারায়ণের মহল্লায় তাঁহার বিখ্যাত লাঠিয়ালদের দৌলতে কাহারও টু শব্দটি করিবার সামর্থ্য ছিল না। লাঠির জোরেই রাজ্যজয় হইত আর লাঠির জোরেই রমণীর সতীত্বলুণ্ঠন হইত। কিন্তু প্রতাপনারায়ণ স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করিতেন সর্বান্তঃকরণে। নারী নরকের দ্বার। এই নারীই তাহার জীবনে দিয়াছিল দাবানল জ্বালাইয়া।

সেবার দুরন্ত বর্ষার এক অবিশ্রান্ত ধারাপতনের দিনে কালু কোথা হইতে এক অজ্ঞাতনামা রমণীকে বহিয়া আনিল। রাত্রি তখন দশটা। চারিদিকে সেই বর্ষাপ্রকৃতির গুঞ্জন কোন্ এক বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। কাহাকে হারানোর বেদনা যেন সারা বিশ্ব মথিত করিয়ারাখিয়াছিল। প্রতাপনারায়ণ তখন সুর্মা দিয়া তাহার নয়নপ্রান্তে রেখাপাত করিতেছিলেন। কালু আসিয়া ডাকিল,—মহারাজ !

প্রতাপনারায়ণ হাঁকিলেন, কে ?..ও।

—এসেছে।

—বিশ্রাম করতে বল্। কতদূর থেকে আসছে ?

—সাত ক্রোশ।

—কেমন ?

—আপনার প্রসাদ পাবার উপযুক্ত।

—উত্তম।

প্রতাপনারায়ণ দ্রুত সাজ সমাধা করিয়া প্রমোদগৃহে উপস্থিত হইলেন। অভাগিনী তখন সেই বিলাসগৃহের এক কোণে বস্ত্রখণ্ডে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল। মনুষ্যপদশব্দে সে প্রতাপনারায়ণের পানে চাহিয়াই বিকট শব্দে আঁতকাইয়া উঠিল। তাহার আয়ত আঁখি, সর্বোপরি তাহার সেই ভীতিসুন্দর দেহলতা প্রতাপনারায়ণের প্রাণে এক উন্মাদনা জাগাইয়া দিল। প্রতাপনারায়ণ তাহার নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার নাম ?

কোনো উত্তর পাইলেন না। পুনরায় বলিলেন, এই যে বিরাট প্রাসাদ, এই অতুল বিভব, সবই তোমার। তুমি আজ আমার রানী।

সেই রমণী কহিল,—না-না, আমি রানী হতে চাই না। আমায় ভিখিরি থাকতে দিন। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে আমার স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে যেতে দিন।

কথাশেষে সে প্রতাপনারায়ণের পদপ্রান্তে পড়িল। প্রতাপনারায়ণ উৎকট হাসি হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, অসম্ভব।

জীবনে এমন নিখুঁত রূপ প্রতাপনারায়ণ আর দ্বিতীয়টি দেখেন নাই। তাহার সেই বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না প্রতাপনারায়ণের নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইল। সেই রমণী কহিল, আমায়ছেড়ে দিন, আপনার ভালো হবে।

প্রতাপনারায়ণ হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার ভালো আমি চাই না।

—আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। আপনার সর্বনাশ হবে। আমার অভিশাপে এ বাড়িঘর জ্বলেপুড়ে যাবে।

প্রতাপনারায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন। সে পুনরায় বলিল, যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি, তবে আমার অভিশাপ কখনো সহ্য করতে পারবেন না। আপনি নির্বংশ হবেন।

অবলা রমণীর যে এমন করিয়া মানুষকে অভিশাপ দিবার ক্ষমতা আছে ইহা ছিল প্রতাপনারায়ণের বিশ্বাসের অতীত। কিন্তু তিনি পরিণামদর্শী ছিলেন না আদৌ। তিনি ওই অবলার সাবধান-বাণী শুনিলেন না। এই তাঁহার জীবনের শেষ শিকার।

পরদিন সারা প্রাসাদে একটা দুরপনেয় বিষাদের ছায়াপাত হইল। সেদিন হইতে সেই রমণী আর উঠিল না বা আহার গ্রহণ করিল না। দুই দিন পূর্ব হইতেই সে উপবাস করিতেছিল। তিল তিল করিয়া সে শুকাইয়া মরিতে লাগিল। সকলে মূক বিস্ময়ে অভাগীর পানে চাহিয়া রহিল। প্রতাপনারায়ণ ভয়-ব্যাকুলচিত্তে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। উহার বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস সহ্য করিবার সাহস তাহার ছিল না। তিন দিন তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অভাগিনী প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে রানী শ্রীক্ষীরোদাসুন্দরীও তাহার দীর্ঘকালের শুচিতা ত্যাগ করিয়া এই নরককুণ্ডে আসিয়াছিলেন অভাগিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। কিন্তু তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। 'যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি, চৌধুরী-বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে'—এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী নারী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

এই ঘটনার সাত দিন পর প্রতাপনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। পথে তাঁহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

সূর্যনারায়ণও পিতাকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন ! অল্প বয়সে সম্পত্তির মালিক হইয়া মোসাহেবের সহায়তায় তাঁহার ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন অপরিণামদর্শী। ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। পরস্ত্রীতে লোভ তাঁহার ছিল না সত্য, তবে তাঁহারও নেশা ছিল। শহর অঞ্চল হইতে সব বিখ্যাত বাইজি আনার নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার জন্য তিনি মুক্তহস্তে ধনব্যয় করিয়া যাইতেন। লখ্‌নউ, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, লাহোর, বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি সকল শহরের সুপ্রসিদ্ধা বাইজিকুলের পদরেণুপাতে তিনি তাঁহার পিতৃপিতামহের পবিত্র প্রাসাদ ধন্য করিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দিনরাত তাহাদের সুরলহরী ও রূপমাধুরীতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বিবাহ করিয়াছিলেন যথাসময়ে। যদিও পিতার ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নীকে ঘৃণা করিতেন না, তথাপি তাঁহার দিন কাটিত বাহির-বাড়িতে। গভীর রাত্রে অতিরিক্ত তাগাদার ফলে মাঝে মাঝে টলিতে টলিতে অন্দর-বাড়িতে উঠিয়া যাইতেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। অধিকাংশ রাত্রিই তাঁহার এই বাহির-বাড়িতে কাটিত। তাহা ছাড়া দেশভ্রমণ তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। একটির পর একটি করিয়া তিনি দেশ দেখিয়া বেড়াইতেন। কত তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছেন, অথচ দেবতা দর্শন করেন নাই, দেবমন্দিরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিতেন, জীবনে তো অনেক পাপ করেছি, মিথ্যে পবিত্র দেবমন্দির আর কলুষিত করি কেন।

অকস্মাৎ একদিন সূর্যনারায়ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া না কহিয়া অতি অসময়ে বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার নাবালক পুত্র শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকে দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবাইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শঙ্করনারায়ণ যখন সাবালক হইলেন তখন তিনি তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটী ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। বনেদী বংশের ধ্বংসাবশেষ লইয়া চৌধুরীপরিবার বিভীষিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। গহনা বিক্রি করিয়া শঙ্করনারায়ণ মানুষ হইয়া উঠিলেন। তিনি কিন্তু মানুষ হইলেন তাঁহার পিতা বা পিতামহের বিপরীত প্রকৃতি লইয়া। ইংরেজি শিক্ষার তিনি ধার ধারিলেন না। তবে অবিচলিত চিত্তে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে কেমন যেন ধর্মভাব জাগিয়া উঠিল, তিনি অল্প বয়স হইতেই ধার্মিক হইয়া পড়িলেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের পূজায় ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ। কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিতেন না। বাড়িতে খাইতেন আর ত্রিতলের ঘরে বসিয়া থাকিতেন। কোথাও বাহির হইতেন না। রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরিয়া গেরুয়াবসনে সর্বাঙ্গ মণ্ডিত করিয়া তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অবসর সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় বেহালাখানায় বসিয়া ছড়ি ঘষিতেন। রাত্রির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া সেই রাগিণী কোনো বন্দিনীবিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় শুনাইত। ক্ষয়িষ্ণু চৌধুরীবাড়ির গৃহলক্ষ্মী যেন ওই ভাষায় গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিয়া মরিত।

শঙ্করনারায়ণও তাঁহাদের বংশের ধারা বজায় রাখিয়া অল্পবয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং খুব অল্পবয়সেই তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নী কল্যাণীকে ঘৃণা করেন নাই সত্য, তবে তাঁহাকে যে ভালোবাসিতেন একথা হলফ করিয়া বলা যায় না। তিনি পত্নীর প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতেন মাত্র। সারাদিন প্রায় তাঁহার গৃহদেবতার ধ্যানধারণায় কাটিত। তিনি নিত্য অত্যন্ত শুচিতাসহকারে দেবতার আরাধনা করিতেন। গভীর রাত্রে পূজায় বসিতেন। যাহা জুটিত সেই সামান্য দুটি শাকান্ন মুখে দিয়া তিনি আবার তাঁহার সেই ত্রিতলের গৃহে যাইতেন। বাড়ি হইতে বাহির হইতেন না আদৌ। দিনদিন চৌধুরীবংশ যে নিশ্চিহ্ন হইবার পথে আগাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া তিনিও ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিলেন। আর ততই তাঁহার গৃহদেবতার পূজার মাত্রাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি পাগলের মতো হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইল—বিত্ত চাই, অর্থ চাই, ঐশ্বর্য চাই। তিনি কেবল প্রার্থনা করিতেন, দেবতা আবার যেন চৌধুরীবংশের নষ্টসম্পদ ফিরাইয়া দেন।...

এহেন কালে একদা চৈত্রের এক অমাবস্যা রজনীতে শঙ্করনারায়ণ স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মী চৌধুরীবংশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অপূর্ব জ্যোতিতে বিশ্বভুবন আলোকিত। একটা সুস্নিগ্ধ সুবাসে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। শঙ্করনারায়ণ ত্বরিতপদে উঠিয়া গিয়া দেবীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দেবী তাঁহার বিষণ্ণ মুখে যেন বলিলেন, বাছা পথ ছাড়, আমায় যেতে দে।

শঙ্করনারায়ণ কাঁদিতে লাগিলেন,—মা, আমাদের এমনি করে ছেড়ে যাচ্ছ মা ?

দেবী নিষ্ঠুরভাবে হাসিলেন।

—নিত্য না খেয়ে তোমার পূজার আয়োজন করেছি মা, তবু তোমার ক্ষুধা দূর হয়নি ?

—না, আমি রক্ত চাই।

—কার রক্ত মা ?

—তোর ছেলের।

দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অমনি শঙ্করনারায়ণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘামে তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি উঠিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসী, এ কি পরীক্ষা তোর ! তখনো তাঁহার সেই গৃহে দেবীর পদ্মগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। শঙ্করনারায়ণ বিচলিত হইলেন না। চৌধুরীবংশ তাঁহার পুত্রের চেয়েও অধিক মূল্যবান। তিনি বলিলেন, তাই হবে মা, তাই হবে। তুমি এ অভাগাকে ত্যাগ করো না।

তার পর তিনি ধীর পদক্ষেপে তাহার শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অতি সন্তর্পণে। কল্যাণী তখন ঘুমাইতেছিলেন আর তাহার পুত্র মাতার স্তন্যপান করিতেছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। শঙ্করনারায়ণ অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেই খোকাকে মাতার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া আনিলেন। কল্যাণী সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন, তিনি একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন মাত্র। শঙ্করনারায়ণ খোকাকে পরম স্নেহে তাঁহার বুকের মধ্যে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সোঁ-সোঁ শব্দে সারা প্রকৃতি যেন উন্মাদ তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। খোকা পিতার বাহুমধ্যে ঘুমাইতে লাগিল। তার পর খোকাকে গৃহদেবীর সম্মুখে নিজ হাতে বলি দিলেন। একবার হয়তো সে কাঁদিয়াছিল, কিন্তু বাহিরের সেই ঝড়জলের মধ্যে সে কান্না হয়তো শোনা যায় নাই। রক্তধারায় সারা-গৃহ ছাইয়া গেল। ভয়ে বিস্ময়ে তিনি কিন্তু দিশাহারা হইলেন না বা বেদনায় মুষড়াইয়া পড়িলেন না। হোমের জন্য যে বালি ছিল তাহা আনিয়া সারারাত্রি তিনি সেই রক্তচিহ্ন মুছিতে লাগিলেন। চৌধুরীবংশ বড় হইবে—জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহার পূরণ হইয়াছে,এই সান্ত্বনায় পরম তৃপ্তিতে সেই বালির উপরই রাত্রিশেষের দিকে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দিনের আলো ফুটিতে না ফুটিতে কল্যাণী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে জাগাইলেন, ওগো, খোকা কোথা গেল ?

শঙ্করনারায়ণ স্ত্রীর পানে চাহিতে পারিলেন না। খোকার মৃতদেহ তখন ভাগীরথীর খরস্রোতে কোন্ দূরান্তরে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই রক্তমাখা বালুকারাশিই তাঁহার শেষ চিহ্ন। কল্যাণী আবার ডাকিলেন, ওগো কথা কও, কথা কও ! আমার খোকাকে এনে দাও !

শঙ্করনারায়ণ আর কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। জীবনে আর তিনি খুব কমই কথা বলেন। যাহা হৌক ব্যাপারটা আর চাপা রহিল না। বুদ্ধিমতী কল্যাণী ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারই অবগত হইলেন। সারাদিন তিনি আর উঠিলেন না, খাইলেন না। সেইদিন রাত্রে তিনিও কুলপ্লাবিনী জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে আত্মবিসর্জন দিয়া তাঁহার বড় আদরের খোকার সহিত মিলিত হইলেন।ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

ঘটনার কিছুদিন পর শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকেও আর পাওয়া গেল না। আজ পর্যন্ত তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই।...

সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। গৃহলক্ষ্মী এখনো সেই ভগ্নপ্রায় বংশহীন চৌধুরীবাড়ির অন্তরালে বন্দিনী আছেন কিনা জানি না। তবে মাঝে মাঝে ওই ধ্বংস্তূপের মধ্য হইতে একটা চাপা হাসি পরম পরিতৃপ্তির সহিত বাহির হইয়া আসে। সেদিনও এমনি ঝড় উঠিয়াছিল; সেদিনও পশ্চিমের আকাশে একটা কালো মেঘ দিগন্ত ছাইয়া রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল, সেদিনও হয়তো ওই শ্মশানঘাটের নিষ্পত্র ঝাউগাছটার মাথায় বসিয়া একটা শকুন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া মরিতেছিল।